ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact factor: 4.5
Volume- I, Issue-VI, July, 2025, Page No. 1609-1620
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.06W.169

তেভাগা ও সাঁওতাল

প্রসেনজিৎ হেমব্রম, *গবেষক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 20.07.2025; Accepted: 23.07.2025; Available online: 31.07.2025
©2025 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

At the dawn of India's independence in the twentieth century, the widely discussed agrarian movement known as the *Tebhaga* movement, supported by the farming community in Bengal and across India, not only aimed to resolve land-related issues and initiate land reforms but also ushered in a new direction in Bengali politics. During this time, just as people across India were engaged in an intense struggle against British colonial rule to gain independence, the farmers of Bengal, fed up with the oppression of landlords, *jotdars*, and intermediaries, joined in an armed uprising against them.

The core demand of the peasants in this movement was not just to receive half of the harvested crop, but *Tebhaga*—that is, two-thirds of the crop yield for themselves, leaving only one-third for the landlord or jotdar. After a year of hard labor, if a farmer had to hand over half of the harvest and use the remaining portion to repay debts or outstanding dues, it became almost impossible for a farming family to sustain themselves on what was left. Their demand was entirely justified; there was no intention of asserting superiority. It was simply a matter of survival. Due to the prevailing economic recession and rising prices of goods in the market, their lives had become unbearable.

This desperation was reflected in the powerful slogans of the movement:

- "*Jan debo, dhan debo na*" (We'll give our lives, but not our crops)
- "*Adhi noy, tebhaga chai*" (Not half, we want two-thirds)
- "*Karja dhaner sud nai*" (There's no interest on grain loans)

As a farmer, what was the relationship between the *Tebhaga* movement and the Santals? What role did the Santals play in the movement? The central theme of this article is to explore the significance of the Santals in the *Tebhaga* movement.

Keywords: Tebhaga, Farmer, Landlord, Jotdar, Santal

বিশ শতকের বিভিন্ন জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সাথে সাথে সাঁওতাল জনগোষ্ঠীরাও বিভিন্ন আন্দোলনে অংশগ্রহণের মাধ্যমে সমাজের মূল স্তরের দিকে এগোতে থাকে। তবে স্বাধীনতা লাভের দোড় গড়ায় বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসে সাঁওতালদের পরিচিতির পথকে প্রশস্ত করে বাংলার কৃষি সম্প্রদায় সমর্থিত তেভাগা আন্দোলন। বিভিন্ন গণ আন্দোলন বা জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে সাঁওতালদের সক্রিয় অংশগ্রহণ দেখা দিলেও, এই তেভাগা আন্দোলন সাঁওতালদের কাছে এক আলাদা রূপ এনেছিল কারণ সাঁওতালদের পরিচিতি ও অস্তিত্ব স্বরূপ ছিল তাদের ‘জমি’ আর এই জমিই ছিল তেভাগা আন্দোলনের মূল বিষয়। আমরা যদি পূর্বেও লক্ষ্য করি তাহলে দেখতে পায় ১৮৫৫ সালের সাঁওতাল বা হুল বিদ্রোহ, যেখানে তারা তাদের জমি ও বাসস্থান এবং অস্তিত্ব রক্ষার্থে

ব্যর্থ হলেও তারা বুঝিয়ে দিয়েছিল ছিল যে জমি হোক বা দেশ, তা রক্ষার্থে তারা জীবন দিতেও রাজি। এই জমি সমস্যা ও সমাধানের উদ্দেশ্যে বাংলায় কৃষক সম্প্রদায় কর্তৃক সংগঠিত তেভাগা আন্দোলন বাংলার কৃষক তথা সাঁওতালদের জন্যও ছিল এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। আদিম কৃষি ব্যবস্থা হইতেই সমাজে ক্রমশ দেখা দিয়েছে মুষ্টিমেয় শোষক ভূস্বামী গোষ্ঠী আর শোষিত জনসাধারণ।[১] তেভাগা আন্দোলন বাংলার ভূমি সমস্যা সমাধান ও সংস্কারের সাথে সাথে বাংলার রাজনীতিতে এক নতুন দিশা দেখিয়েছিল। এই সময় সমস্ত ভারতবাসী যেমন ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা লাভের জন্য সর্বোচ্চ পর্যায়ে আন্দোলনে নেমেছিল তেমনি বাংলার কৃষক সম্প্রদায়ও জমিদার, জোতদার ও মধ্যস্বত্ব ভোগীদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে তাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র আন্দোলনের শামিল হয়েছিল। তেভাগার আন্দোলন বাংলা তথা ভারতের কৃষকদের মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠায় যে ভূমিকা নিয়েছে একমাত্র তেলেঙ্গানার কৃষক বিদ্রোহ ছাড়া অন্য কোনো কৃষক বিদ্রোহই তার সঙ্গে তুলনায় আসে না।[২] এই আন্দোলনে কৃষকদের মূল দাবি ছিল- জমিতে উৎপাদিত ফসলের অর্ধেক নয় ফসলের দুই-তৃতীয়াংশ চাই অর্থাৎ তেভাগা চাই এবং বাকি এক শতাংশ জমিদার বা জোতদারের জন্য। সারাবছর কঠোর পরিশ্রমের পর উৎপাদিত ফসলের অর্ধেক অংশ যদি জোতদারকে দিতে হতো এবং বাকি অংশ থেকে ঋণ বা বকেয়া টাকা মেটাতে হয় তাহলে অবশিষ্ট ভাগ থেকে একটি কৃষক পরিবার চালানো কঠিন হয়ে পড়েছিল। একজন কৃষকের এই দাবি সম্পূর্ণ ন্যায্য ছিল,এতে তাদের কোন আভিজাত্য বজায়ের উদ্দেশ্য ছিল না। অবশিষ্টাংশ ফসল থেকে তাদের দৈনন্দিন জীবনযাপন চালানো কঠিন হয়ে পড়তো। তৎকালীন অর্থনৈতিক মন্দা ও বাজারের পণ্যের মূল্য বৃদ্ধির জন্য তাদের জীবন দুর্বিসহ হয়ে উঠেছিল। এই আন্দোলনে কিছু স্লোগানের মাধ্যমে তাদের হতদরিদ্রের ছবিটি স্পষ্ট ছিল- 'জান দেবো ধান দেবো না', 'আধি নয় তেভাগা চাই, কর্জা ধানের সুদ নাই'। তেভাগা আন্দোলনের মাধ্যমে কৃষক মজদুর ও শ্রমিক শ্রেণীর উদ্ভব ঘটেছিল বাংলা সমাজে, তবে এই শ্রেণী উত্থানের নেপথ্যে ছিল তৎকালীন কমিউনিস্টদের আক্লান্ত পরিশ্রম ও সহযোগিতা। তারা মনে করেছিলেন সমাজের নিম্ন শ্রেণী খেটে-খাওয়া শ্রেণীর মানুষেরা দেশের মেরুদণ্ড, তাদের জীবনে যদি অনিশ্চয়তা থাকে, তাহলে দেশের স্বাধীনতা মূল্যহীন। এ প্রসঙ্গে গণশক্তিতে প্রকাশিত হয়- শ্রমিক শ্রেণীর ও তাহাদের প্রতিষ্ঠান এমন এক শক্তিতে পরিণত হইবে, যে শক্তি শুধু স্বদেশের জন সাধারনের নয় সমগ্র মানব জাতির ভাগ্যকে প্রভাবিত করবে।[৩]

১৯৪৬ সালের নভেম্বর মাসে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভার নেতৃত্বে কৃষক হিসেবে পরিচিত- মুসলিম, সাঁওতাল, রাজবংশী ও আদিবাসী সম্প্রদায় সম্মিলিত হয়ে বাংলার ২২টি জেলার ১৯ টিতে প্রায় ৬০ লক্ষ কৃষক তেভাগা আন্দোলন শুরু করে। সাধারণভাবে প্রশ্ন আসে এই তেভাগা আন্দোলনে আদিবাসী তথা সাঁওতালদের ভূমিকা কি বা তেভাগা আন্দোলনের সাথে সাঁওতালদের কি সম্পর্ক ছিল বা তেভাগা আন্দোলনে সাঁওতালদের কি ভূমিকা ছিল? এ প্রসঙ্গে প্রথমেই বলা দরকার বাংলায় সাঁওতালদের পরিচিতি ছিল- কৃষক, ভাগচাষী, ক্ষেতমজু, শ্রমিক মজদুর হিসেবেই। সাঁওতালদের প্রায় ৮১% ছিল চাষাবাদের সাথে যুক্ত।[৪] জমির সাথে সাঁওতালদের সম্পর্ক নতুন নয়, আদিকাল থেকেই তারা জমির সাথে নিবিড়ভাবে যুক্ত। জমিই সাঁওতালদের অস্তিত্ব বা পরিচয়। এই সাঁওতালরা কৃষি ব্যবস্থার আওতায় কিভাবে এসেছিল- তার বিবরণ জানতে আমাদের অতীতে কিছু ঘটনার উল্লেখ প্রয়োজন।

বাংলায় কৃষি ব্যবস্থার পরিকাঠামো বা কৃষি ব্যবস্থার বিবরণ আমরা বিস্তারিতভাবে ব্রিটিশদের কাছ থেকেই পায়। মধ্যযুগে বাংলায় কৃষি ব্যবস্থা বা রাজস্ব নিয়ে দু-এক কথা বলা হলেও বিস্তারিত আলোচনা তেমনভাবে হয়নি। মুঘল আমলারা বাংলার কৃষি ব্যবস্থার ওপর তেমন জোর দেয়নি, তবে ১৭৫৭ সালে বাংলা দেওয়ানি লাভের পর বাংলা কৃষি ব্যবস্থা থেকে রাজস্ব ধার্য ব্রিটিশদের কাছে প্রধান উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ায়। কৃষিভিত্তিক বাংলার কৃষি ব্যবস্থা ব্রিটিশদের নজরে পড়ে কিন্তু এর মাধ্যমে কৃষি ব্যবস্থার উন্নয়ন তাদের লক্ষ্য ছিল না। তাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল কৃষি ব্যবস্থা থেকে খাজনা আদায়। কিন্তু ১৭৭০ সালের দুর্ভিক্ষ বা ছিয়াত্তরের মন্বন্তর বাংলা কৃষি ব্যবস্থাকে পুরোপুরি ভেঙে ফেলে। মন্বন্তর প্রসঙ্গে হান্টার বলেন- It was an appaling spectre on the threshold of British rule in Bengal.[৫] চাষযোগ্য জমি পতিত জমিতে বা জঙ্গলে পরিণত হয়ে পড়ে। অসংখ্য মানুষ মারা যায় এবং এরপর বাংলায় চাষের জন্য প্রচুর পরিমাণে কৃষকের প্রয়োজন পড়ে। দুর্ভিক্ষের ফলে মোট জনসংখ্যার প্রায় ৩৫ শতাংশ এবং চাষীদের ৫০ শতাংশ মারা গিয়েছিল।[৬] এই জঙ্গলাকীর্ণ জমি বা পতিত জমি পরিষ্কার করে, তা

চাষযোগ্য জমি হিসেবে গড়ে তোলা ছিল প্রচুর পরিশ্রমসাধ্য। এই অসাধ্য সাধনের উদ্দেশ্যে বাংলায় কৃষি ব্যবস্থায় আগমন ঘটে সাঁওতাল কৃষকদের। পূর্বেও সাঁওতালরা বিভিন্ন অঞ্চলে নিজেদের মতো করে জঙ্গল পরিষ্কার করে বসবাস করত ও চাষাবাদ করতো। কিন্তু বহির্জগতের সাথে তাদের তেমন যোগাযোগ না থাকায় সমাজে মূল স্রোত থেকে দূরে ছিল। বলা ভাল তারা নিজেদের আলাদা রাখতে পছন্দ করত। কিন্তু সাঁওতালদের স্থায়ী বসবাসের জায়গা বা চাষাবাদের জায়গা ছিল না। এই দুর্ভিক্ষের পর ব্রিটিশরা সাঁওতালদের আমন্ত্রণ জানায় কারণ ব্রিটিশরাও বুঝেছিলেন এই কঠিন পরিশ্রমসাধ্য কাজ সাঁওতাল ছাড়া অন্যদের দিয়ে অসম্ভব। অবশেষে পরিশ্রমী সাঁওতালরা এই জঙ্গলাকীর্ণ জমি কে পরিষ্কার করে চাষযোগ্য জমি করে তুলে। বাংলার কৃষি ব্যবস্থাকে দাঁড় করাতে সচেষ্ট হয়। কিন্তু পরবর্তীতে জমিতে চাষাবাদ শুরু হলে সাঁওতাল বা কৃষকদের কথা না ভেবে ব্রিটিশরা তাদের খাজনা বৃদ্ধি করতে থাকে। ব্রিটিশরা কৃষি থেকে রাজস্ব তোলার সুবিধার্থে ১৭৯৩ সালে লর্ড কর্নওয়ালিসের তত্ত্বাবধানে চিরস্থায়ী ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন,এর মাধ্যমে বাংলা কৃষি ব্যবস্থায় চরম দুর্দশা নেমে আসে। রঞ্জিত দাসগুপ্ত বলেন- চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে খাস মহলের কৃষক, মালিক এবং প্রজা কৃষকরা জমি বিক্রি করতে বাধ্য হয়েছিল জোতদার ও জমিদারদের প্রতারণায়।[৭] প্রথমেই কৃষকদের সম্পূর্ণভাবে বিতাড়িত করা হয়নি,তাদেরকে জমিতে বর্গাদার বা আধিয়ার হিসেবে রেখে দেওয়া হয়েছিল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত শর্তগুলি ছিল- (১) যাদের সাথে বন্দোবস্ত হলো তারাই জমির মালিক বলে বিবেচিত হলো, (২) যারা বন্দোবস্ত গ্রহণ করল তাদের ভূমি রাজস্ব চিরকালের জন্য স্থিরীকৃত হল অর্থাৎ তার পরিমাণ পরিবর্তিত হবেনা এবং এটি একটি নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে দিতে হবে ,দেশে যতই দুর্ভিক্ষ আসুক না কেন,ভূমি রাজস্বের হার সমানই থাকবে, (৩) যদি ভূমি রাজস্ব সঠিক দিনে দেওয়া না হয় তাহলে ওই জমি বিক্রি করে সেই ঘাটতি পূরণ করতে হবে, (৪) জমির মালিকদের প্রচেষ্টায় কৃষির যে ঐশ্বর্য বাড়বে তা সম্পূর্ণ ভোগ করার অধিকার কেবলমাত্র মালিকদের থাকবে। ধীরে ধীরে এই কৃষি ব্যবস্থা জমিদারদের সাথে সাথে বিভিন্ন মধ্যসত্তা ভোগী ও জোরদারদের গোষ্ঠী তৈরি করে। বিনয়ভূষণ চৌধুরি বলেন- জোতদারী শক্তির উপস্থাপন গ্রামের সমাজকে আরো সমালোচনামূলক করে তুলেছিল। তিনি প্রাক-ঔপনিবেশিক এবং ঔপনিবেশিক সময়ের মধ্যে কৃষি ব্যবস্থা পার্থক্য দেখানোর চেষ্টা করেছিলেন,পার্থক্য গুলি ছিল- (এক) শক্তিশালী শ্রেণীর উত্থান, (দুই) তাদের সংগঠন, (তিন) তাদের দখলে থাকা জমির পরিমাণ। আর কৃষকরা এই জমিদার, জোতদার, ও মধ্যসত্ত্বাভোগীদের রাজস্ব দিতে দিতে সর্বস্ব হারিয়ে ফেলত।[৮] মুঘল আমলে কৃষকরা রাজস্ব বা খাজনা দিতে না পারলেও কখনোই জমি হাতছাড়া হত না অথচ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে কৃষকদের জমিও বলপূর্বক কেড়ে নেওয়া হত। বাংলাদেশের জমি আকর্ষণের বস্তু কারণ দেশের ঐশ্বর্য স্বরূপ জমির যখন অভাব ছিল না, তখন লোক সংখ্যার অভাব ছিল। তখন কোন সমস্যা লোকেদের চোখে পড়তো না অথচ যখন লোকসংখ্যা বেড়েছে জমির উপর চাপ বেড়েছে, তাই সমস্যা গভীর হয়েছে। জমি যেখানে দেশের প্রধান অবলম্বন সেখানে জমির সদ্ ব্যবহার হচ্ছে কিনা এ প্রশ্নই গড়ার কথা। রোজ সত্য আইনের ভালো মন্দ বিচার করতে হইলে আমাদের প্রথম দেখতে হইবে কৃষির উন্নতি হয়েছে কিনা এবং জমির উৎকর্ষ সর্বপ্রকারের রক্ষিত হচ্ছে কিনা, কৃষি ও জমি উভয়ের উন্নতি সাধন-প্রজাস্বত্ব আইনের সার্থকতা।[৯] এই আইন সাঁওতাল কৃষক তথা বাংলা সমস্ত কৃষক এর কাছে এক অন্ধকার যুগের সূচনা করেছিল। সাঁওতালরা চাষাবাদে আগ্রহী ছিল এবং কম মজুরিতে জঙ্গল পরিষ্কার করে চাষযোগ্য জমি তৈরি করেছিল এমনকি অন্যান্য হিন্দু কৃষকরা তাদের জাত হারানোর ভয়ে জঙ্গল পরিষ্কার করতে ইচ্ছুক ছিল না। তাই বাংলার এই জমি উদ্ধারের একমাত্র বিকল্প ছিল সাঁওতালরা। তারপরেও সাঁওতালদের বা কৃষকদের কোন উন্নতি বা তাদের উন্নয়নের জন্য কোন ব্যবস্থাই গ্রহণ করা হয়নি। যা হয়েছিল শুধুমাত্র জমিদার, জোতদার ও মধ্যসত্বভোগীদের স্বার্থে। যার ফলস্বরপ ১৮১৮ দিকে সাঁওতালরা দামিন-ই-কোহর দিকে অগ্রসর হয়। পরবর্তীতে সাঁওতালরা ব্রিটিশ সরকার ও তাদের আশ্রিত জমিদারদের বিরুদ্ধে ১৮৫৫ সালের ৩০ শে জুন হুল বা সাঁওতাল বিদ্রোহের ডাক দিয়েছিল। অনেকে এই আন্দোলনকে সাঁওতালদের পরিচিতি স্বত্বাভিত্তিক আন্দোলন বললেও সাঁওতালরা তাদের অস্তিত্ব রক্ষার স্বার্থে তাদের এই জমিই বাঁচানোর চেষ্টা করেছিল এবং এই সাঁওতাল বিদ্রোহের সাথে সাথেই সাঁওতালরা ভারতবর্ষের বিভিন্ন জাতীয়তাবাদী ও গণ আন্দোলনে যুক্ত হয়েছিল অত্যাচারিত কৃষক রূপে। ১৮৫৫ এর সাঁওতাল বিদ্রোহের পর বাংলার বীরভূম, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর ছাড়াও উত্তরবঙ্গের দিনাজপুর, জলপাইগুড়ির দিকে বসতি স্থাপন করতে থাকে এবং উত্তরবঙ্গে সাঁওতালরা আধিয়ার বা ভাগ চাষী হিসেবে কাজ

শুরু করে এবং ডুয়ার্সে চা- শ্রমিক বা জমির সাথে যুক্ত মজদুর হিসেবে নিযুক্ত হত। যেখানে কৃষি দেশের মূল স্তম্ভ সেখানে কৃষি ব্যবস্থা ভগ্নপ্রায় এবং কৃষকদের অবস্থা ছিল জীবিত লাশের স্বরূপ বাংলায় কৃষক বা কৃষি ব্যবস্থা ভেঙে পড়ার অন্যতম কারণ ছিল এই জমিদারি প্রথা ও জোতদারি ব্যবস্থা। আমরা যদি মেদিনীপুর জেলা লক্ষ্য করি সেখানে দেখা যায় বহু ছোট-বড় জমিদার ও ভূস্বামী এখানে বসবাস করতেন। মুঘল আমলে এইসব জমিদার বৃন্দ মাঝেমধ্যে শাসকদের নামমাত্র কর দিতেন। যেহেতু এই অঞ্চল ছিল দুর্গম বিপদ সঙ্কুল,সেজন্য মুঘল শাসক বৃন্দ তাতেই সন্তুষ্ট থাকতেন এবং এখানে কোন প্রশাসনিক হস্তক্ষেপ করতেন না। তার ফলে এই অঞ্চলের জমিদারদের স্বাধীনভাবে রাজস্ব আদায় করতে অসুবিধা হয়নি। জমিদারদের অধীনে থাকতো বেশ কয়েকজন সর্দারের। সর্দারের দের অধীনে থাকতো পাইকরা এরা দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করত। জমিদারদের এইসব কর্মচারীরা হাতে নগদ বেতন পেতো না। পারিশ্রমিক হিসেবে জমিদারদের কাছ থেকে তারা পেতো স্বল্প খাজনা বা খাজনার বদলে চাষযোগ্য জমি। কোম্পানি শাসন চালু হওয়ার পরও মেদিনীপুর জেলাসহ উত্তরবঙ্গে এই ব্যবস্থা কায়েম ছিল কিন্তু ইংরেজ শাসন চালু হওয়ার পর থেকে চিরাচরিত প্রথাগুলির উপর আঘাত নেমে আসে এবং তৈরি হয় মধ্যসত্ত্বাধিকারী গোষ্ঠীর। ১৮৭২ সালে জেলায় যে চৌহটি ছিল তাতে জেলার আয়তন ছিল ১২৫২৫ বর্গ কিলোমিটার এই বিশাল জমির বেশিরভাগটাই ছিল নানান মধ্যসত্ত্ব অধিকারীদের হাতে। জমিদার মধ্যে পুরুষ ৯৮৮জন ও ৩৮১ জন স্ত্রী, ইজারাদারদের পুরুষ ৩৩৭ জন ও মহিলা ২ জন,তালুকদারদের পুরুষ ২২৫ জন ও ৩১৩ জন স্ত্রী, পট্টনিদারদের মধ্যে পুরুষ ১৪৪জন ও মহিলা ১১ জন, জোতদারদের মধ্যে ৪০২ জন পুরুষ। সবমিলিয়ে সংখ্যা ছিল ৪৬১৩ জন জমিসত্ত্ব অধিকারী আর চাষী পরিবার ছিল ১৫৭৪।[১০] ব্রিটিশ কর্তৃক গৃহীত কৃষির বৈচিত্র্যপূর্ণ বিস্তারের ফলে সাধারণ চাষী আর্থিক সমৃদ্ধি ও জীবনের নিরাপত্তা এসেছিল ভাবার কারণ নেই বরং সমাজের নিম্নবর্গের দারিদ্র ও সহিষ্ণুতার পরিপ্রেক্ষিতে কৃষি জমির বিস্তার ছিল জমিদার ও জোতদারদের দ্যোতক। কঠোর পরিশ্রমের বিনিময়ে উৎপাদিত ফসলের থেকে নানাভাবে বঞ্চিত হত তারা। খরা-অতিবৃষ্টির মত প্রকৃতিক খেয়ালিপনা তো ছিলই,তার উপর ছিল জমিদারদের নানাবিদ অবৈধ আদায় এবং জমিদার পত্তনী ও আমলাদের বহুমুখী দুর্নীতি মূলক শোষণ। জমির খাজনা ছিল অত্যাধিক তার সঙ্গে ছিল উচ্চহারে বহু বিচিত্র ধরনের “আবওয়াব” বা “সেসের” বোঝা সুতরাং সংশ্লিষ্ট চাষীর নিবিড় চাষে উৎসাহ না থাকায় ছিল স্বাভাবিক।

এর সাথে ছিল দাদন প্রথা- এই প্রথা কৃষকদের আর্থসামাজিকভাবে বেঁধে রাখার আরেকটি উপায়। চাষিরা এতটাই দারিদ্র্য ছিল যে দাদন না নিয়ে তাদের উপায় ছিল না একজন ইংরেজ বাণিজ্য বিশেষজ্ঞ যথার্থই মন্তব্য করেছিলেন এদেশে কোন উৎপাদনশীল কাজের জন্য দাদন অপরিহার্য। চাষীদের দাদন দিয়ে বণিক ব্যবসায়ীরা কৃষি পণ্যের বাজার নিয়ন্ত্রণ করত ফলে মুক্ত প্রতিযোগিতামূলক বাজারের কোন সুবিধায় চাষিরা পেতো না। ধান চাষীদের ক্ষেত্রে কথাটি বিশেষভাবে সত্য, চাষী সমাজের তারাই ছিল বৃহত্তম অংশ। কর্মহীন দিনগুলোতে নিতান্তই বেঁচে থাকা ও চাষের কাজ চালিয়ে যাওয়ার প্রয়োজনে ধানের বেপারীদের কাছে দাদর নিতে বাধ্য হত তারা। ফসল তুলে সুদে-আসলে শোধ করাই ছিল প্রধান শর্ত। কিন্তু হিসাব নিকাশের পর সামান্য সাশ্রয় তাদের হাতে থাকত। বছরের বেশিরভাগ সময় ক্রেতা হিসেবে তাদের নির্ভরতা ছিল খোলা বাজারের উপর অথবা মুদির দোকানে ধারে, তাদের সঙ্গে ধারে কিনতে গেলে দেখা যেত চড়া দাম ও চড়া সুদ। খোলা বাজার নিয়ন্ত্রণ করত বড় ধান চাষী ও জোতদার (যারা আসলে একই শ্রেণী ভুক্ত) এবং পাইকার মহাজনরা। তার উপর সাগর পাড়ের বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক সংকটের ধাক্কাও ভোগ করতে হত। বলা যায় চাষীদের কৃষি উদ্ধৃত আয় নিয়োজিত থাকত জমিদারি মহলে ক্রয় অথবা মহাজনি কারবারে।[১১]

উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রে ভাগচাষীদের পরিস্থিতি যে খুব ভালো ছিল তা নয়, দক্ষিণবঙ্গের মতো উত্তরবঙ্গের চাষীদেরও অবস্থা ছিল খুবই শোচনীয়। স্বাভাবিকভাবেই এই চাষীদের একটি বড় অংশ ছিল সাঁওতাল সম্প্রদায়। ১৮৫৫-এর হুলের পর সাঁওতালরা উত্তরবঙ্গের দিকে বসতি স্থাপন করতে থাকে। উত্তরবঙ্গে রাজবংশী ও মুসলমানরা ছিল মূলত কৃষক আর জনজাতিদের মধ্যে প্রধানত সাঁওতাল ও মালপাহারিয়া গোষ্ঠীর পরিবার বেশি ছিল। রাজমহলের নিকট গঙ্গা পার হয়ে পশ্চিম দিনাজপুর,জলপাইগুড়ি,মালদা ও কোচবিহারে যেমন কাজের সন্ধান পাওয়া গেছে, এইসব জনজাতির বসতি বৃদ্ধি পেয়েছে। দিনাজপুরের প্রায় পুরো এলাকা জুড়েই সাঁওতালদের অবস্থান ছিল এবং জনজাতির ৬৩ শতাংশ ছিল কৃষক ৩২ শতাংশ ছিল ভাগ চাষী চাষের সাথে যুক্ত শ্রমিক।[১২] এই জেলায় যারা দীর্ঘদিন কাজ

করেছেন তারা মনে করেন রংপুরের চাষাবাদ অনুপাতে সবচেয়ে ভালো তবে জেলার দু ফসলের জমি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কাজের চাহিদায় এলেও সবাই কৃষক হতে পারেনি,কিছুজন চাষের সাথে যুক্ত মজদুর এবং কিছুজন শ্রমিক হিসেবে জীবন যাপন শুরু করে। কিন্তু জনসংখ্যার অনুপাতে মাটি থেকে বেশি কিছু অর্জন করতে পারে না তার জন্য শীতকালে প্রচুর বিহারী ও সাঁওতাল শ্রমিক আসত ফসল তোলার কাজে।[১৩]

জলপাইগুড়ির ক্ষেত্রেও উপজাতি হিসেবে সাঁওতালদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা লক্ষ্য করা যায়। সাঁওতালদের বেশিরভাগই এখানে চাষের সাথে যুক্ত ছিল। সাঁওতাল পুরুষ শ্রমিকদের প্রায় ৫৫.৩৯ শতাংশ চাষী ও ৬.৩৬ শতাংশ চাষের সাথে যুক্ত মজদুর এবং সাঁওতাল নারী শ্রমিকদের মধ্যে ৫০.৬৬ শতাংশ কৃষক এবং তাদের ৬.৫% মজদুর হিসেবে নিয়োজিত ছিল। তাছাড়া ৩৪ শতাংশ সাঁওতাল শ্রমিক বৃক্ষরোপণের কাজে যুক্ত ছিল ।[১৪] ১৮৫৪ সালে ইস্ট ইন্ডিয়ান রেলওয়ে, বীরভূম জেলার মধ্য দিয়ে সাঁওতাল পরগনা এবং রাজমহলের সীমানা হয়ে উত্তরবঙ্গের সাথে মিলিত করেছিল তাতে প্রচুর সংখ্যায় কুলি ও শ্রমিকের প্রয়োজনে অসংখ্য সাঁওতালদের নিয়োগ করা হয়েছিল । এর সাথে ডুয়ার্সের চা বাগানে পরিচর্যা থেকে শুরু করে রক্ষণাবেক্ষণ সবকিছু করানোর জন্য প্রচুর সাঁওতাল শ্রমিকদের নিয়োগ করা হতো। উল্লেখ্য- যে সমস্ত খ্রিস্টান মিশনারীরা গত শতাব্দী থেকে ধর্মপ্রচার ও সমাজ সেবামূলক কাজ শুরু করেছিলেন তারা অল্প সময়ের মধ্যে সাঁওতালদের খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষিত করে তুলেছিলেন। ১৮৯০ সালে খ্রিস্টান সোসাইটি সাঁওতাল কৃষিবিদদের সাথে এগ্রিকালচারাল কলোনী খোলেন।[১৫] অর্থাৎ উনিশ শতকের মধ্য থেকেই সাঁওতালদের আধিক্য দেখা যায় উত্তরবঙ্গে। ১৯১০ সালে বীরভূম জেলা গ্যাজেটিয়ারে লেখা হয়- Many of the santhals particularly from the northern portion have owing to greater pressure on the soil or to dispossession by mahajans or zamindar either emigrated to the Barind,a quasi laterite tract of country in the Dinajpur, Rajshahi and Bogra or else to Murshidabad. There to break fresh country to clear the jungles and make new terraoes of rice land for doing which they posses' singular aptitude, even in the most unpromising country.[১৬]

আধি ব্যবস্থা বা আধাহারে চাষ উত্তরবঙ্গের অন্যতম চাষ ব্যবস্থা ছিল। এই ব্যবস্থাটি ছিল বহুল প্রচলিত ও প্রাচীন। প্রাচীনত্বের ব্যাপারে বুকানন হেমিলটন বলেন- সমাজের দরিদ্র শ্রেণীর মধ্যে সাধারণ শ্রমিকদের সাথে ভাগচাষী ও নিম্ন কারিগরদের বিচার করেন। আধিয়াররা অবশ্য প্রথমে শ্রমিকদের চেয়ে ভালো অবস্থাপণ্য ছিল। তাদের লাঙল ছিল এবং তা দিয়ে চাষ করতো। তারা যদি আরো জমিতে কাজ করতে পারতো তাহলে তারা আরো বেশি আধি নিত। তারা বছরের ছয় মাস ছোট রায়তদের সাথে কাজ করতো, যারা বড় চাষীদের কাছ থেকে অগ্রিম অর্থ শস্য ধার নিতো কিন্তু পরবর্তীতে জমিদাররা ও জোতদারা অর্থের লোভে এই ভাগ চাষীদের জীবন দুর্বিষহ করে তুলেছিল। বেশিরভাগ জোতদাররা ভাড়াটে শ্রমিকদের দিয়ে চাষ করাতে পছন্দ করত এবং আধিতে জমি দিত কারণ তাদের কাছে কাজটি তদারকি করার সময় ছিল না। যখন জমিতে ভালো ফসল হতো তেমনি তারা মনে করত শ্রমিকদের জন্য অর্থব্যয়ের চেয়ে শস্যের অর্ধেক পাওয়া ভালো ছিল। হতভাগ্য আধিয়াররা সামান্য শস্য ও অর্থ আয়ের সন্ধানে রাজি হয়ে যেত। এই আধিয়াররা তাদের নিজেদের গবাদী পশু ও লাঙ্গল এবং নিজেদের পরিশ্রমে ফসল উৎপাদন করত, পরিবারের জীবিকা নির্বাহ করার জন্য অথচ এই আধিয়ারদের জমির উপর কোন অধিকার ছিল না, ছিল না তাদের কাজের নিশ্চয়তা, এমনকি জোতদাররাই ঠিক করে দিত কোন ফসল চাষ করা হবে এবং জোরদার কতৃক চাষী নিযুক্ত করা এটি ছিল অনেকটা প্রভু ও ভৃত্তের সম্পর্কের একটি চিহ্নস্বরূপ। তাছাড়াও অতিরিক্ত সুদ, নানা রকম বেআইনি ও বাজে আদায় ও জমি মালিকের অন্যায় জুলুম ছিল ভাগচাষিদের জীবনের চির সাথী। এর সাথে জীবনযাত্রার ব্যয় বেড়ে যাওয়ায় চাষের খরচও অনেক গুণ বেড়ে যায়। অন্যদিকে তাদের আয় কমতে থাকে। সারা উত্তরবঙ্গের প্রায় তিন ভাগ চাষীর এই অসহনীয় দুরবস্থা হয়ে উঠছিল। কৃষকদের এই অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের ফলে সমগ্র সাঁওতাল সমাজ এক অভূতপূর্ব সংকটের সম্মুখীন হয়- সংকট শুধু মাত্র অর্থনৈতিক নয় সাংস্কৃতিক ।[১৭]

বিশ শতকে প্রথম থেকে বাংলায় বিভিন্ন জাতীয়তাবাদী আন্দোলন সংঘটিত হতে থাকে। সমস্ত ভারতবাসী স্বাধীনতা লাভের আশায় আন্দোলন গুলিকে চোখ বন্ধ করে সমর্থন ও অংশগ্রহণ করতে থাকে। কিন্তু এসবের

পেছনে বাংলার ভূমি সমস্যা বা কৃষকদের উন্নতির জন্য কোন নীতি বা সমাধান গ্রহণ করা হয়নি বা বলা ভালো কৃষকদের স্বার্থ রক্ষার কোন চেষ্টাই করা হয়নি। বিশেষ করে গান্ধীজীর উত্থানের পর কংগ্রেস নেতা এবং মুসলিম লীগের নেতারা মধ্যবিত্ত ও অভিজাত শ্রেণীর সঙ্গে করে স্বাধীনতা লাভের কথা বলেন। অবশ্যই স্বাধীনতা প্রয়োজন কিন্তু কৃষি ভিত্তিক দেশে কৃষকরা যদি স্বাধীন না হয় বা জমির উপর তাদের অধিকার না থাকে তাহলে কোথাও না কোথাও এই স্বাধীনতা কৃষকদের কাছে পরাধীনতার চেয়ে কম নয়। এই পরিস্থিতিতে বীরভূম,বাঁকুড়া, মেদিনীপুর ও মানভূমের কিছু অংশ যা জঙ্গলমহল নামে পরিচিত ছিল সেখানে চাষাবাদ শুরু করে সাঁওতালরা,স্থায়ী জমির সন্ধানে ছিল। কারণ পূর্বেই সাঁওতালদের সাথে মুন্ডা সহ ও অন্যান্য অন্যান্য গোষ্ঠীর জমি নিয়ে লড়াই লেগে থাকত।[১৮] উত্তরবঙ্গে সাঁওতাল ও রাজশাহীদের লড়ায় লেগে থাকত। কৃষকদের অবস্থার কোন পরিবর্তন হয়নি বরঞ্চ পরিস্থিতি আরো খারাপ থেকে খারাপতর হতে থাকে। সাথে সাথে সাঁওতাল কৃষকদেরও করুণ অবস্থায় সৃষ্টি হয়। তারা ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ে এবং জমিও হারাতে থাকে। এই জমি হারানোর কারণ হিসেবে একটি সরকারি রিপোর্টে বলা হয়েছিল- (এক) মহাজনদের তীব্র কূটনীতি, (দুই) মহাজনদের গ্রামের প্রধান হয়ে ওঠা, (তিন) কঠোর জমিদারি ব্যবস্থা, (চার) অক্ষত গ্রামকে ভেঙ্গে ফেলা। এর সাথে সাথে কিছু আভ্যন্তরীণ কারণও দেখানো হয়েছিল- অধিক পানীয় গ্রহণ, শিক্ষার অভাব,বশ্যতা।[১৯] ব্রিটিশ বিরোধী অসহযোগ আন্দোলন ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ফলে কৃষক ও শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতিতে কংগ্রেস সরকার হাত তুলে নেয় কংগ্রেস সরকার পূর্বে থেকেই কৃষক এবং কৃষি সমস্যার ব্যাপারে উদাসীন ছিলেন। এ প্রসঙ্গে পার্থ চ্যাটার্জি তার বইটিতে বলেন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস দরিদ্র কৃষক ও বর্গাদারদের অধিকারের পক্ষে দাঁড়ায়নি, কংগ্রেস পার্টির নেতারা জমিদার, জোরদার ও মধ্যস্বত্বভোগীদের স্বার্থ বজায় রাখার চেষ্টা করেছিল। কংগ্রেস নেতারা মনে করেছিলেন যে যতক্ষণ না ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে তাদের স্বাধীনতা লড়াই শেষ হচ্ছে ততক্ষণ কৃষক ও জমিদারদের মধ্যে সামঞ্জস্যপূর্ণ নীতি গ্রহণ গ্রহণ করা যাতে স্বাধীনতা লাভের আগে গৃহযুদ্ধের সৃষ্টি না হয়।[২০] তার প্রমাণ পাওয়া যায় ১৯২৮ সালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক আইন সভায় প্রজাস্বত্ব আইন রচনা ক্ষেত্রে কংগ্রেসের সদস্যদের কৃষক বিরোধী অবস্থান গ্রহণের দ্বারা একটি আইন পাশ করা হয়েছিল যেখানে বলা হয়েছিল- (এক) বিনা নোটিশে বর্গাদারদের জমি থেকে উচ্ছেদ করতে পারবে জমিদাররা, (দুই) দরিদ্র প্রজার জমি বিক্রয়ের সময় বিক্রয় মূল্যের ভাগ সেলামী হিসেবে জমিদারকে দিতে বাধ্য করা হয়, (তিন) জমি ক্রয়ের অধিকার দেওয়া হলো জমিদারকে,যাতে সে নিজের ইচ্ছেমতো দামে জমি কিনতে পারে। অর্থাৎ সাধারণ কৃষক যেখানে নিজেদের জমি ও অধিকার পাওয়ার জন্য সমস্ত কিছু করতে রাজি হয়েছিল সেখানে বাংলার কংগ্রেস নেতৃবৃন্দরা ব্রিটিশ সরকারের সাথে সহমত পোষণ করে এই কৃষক বিরোধী আইনটি পাস করিয়ে দেয়। এ প্রসঙ্গে ফজলুল হক বলেছিলেন- যেভাবে এই বিলটি আইনে প্রণয়ন করবার জন্য উপস্থাপিত করা হয়েছিল তাতে গত পঞ্চাশ বছরের মধ্যে যত বিল পাস করবার জন্য এই কাউন্সিলে আনা হয়েছে, তার মধ্যে এটিই সবচেয়ে জরুরি। আমরা সাধারণ মানুষের ভোটেই এই কাউন্সিলে নির্বাচিত হয়েছি যাদের মধ্যে ৯৫ শতাংশ হচ্ছে রায়তদের দলে এবং এখন যে অবস্থা দাঁড়িয়েছে যে, হয় আমরা রায়তদের স্বার্থ রক্ষার ভার নেব, না হলে আমাদের এই কাউন্সিলের সদস্যপদ ত্যাগ করতে হবে। এই কাউন্সিলে থাকাবার বিন্দুমাত্র অধিকার আমাদের থাকবে না যদি না আমরা অগণিত লক্ষ লক্ষ মানুষের স্বার্থ রক্ষার ভার গ্রহণ করতে পারি,যারা ভোট দিয়ে আমাদের এখানে পাঠিয়েছে। এই বিশ্বাস দিয়ে আমরা যেন তাদের দাবির কথা এই কাউন্সিলের সামনে তুলে ধরতে পারি।[২১] ১৯৩০ এর দশকে বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দা, বিশেষত ফসলের দর ৫৫ শতাংশ কমে যাওয়া এবং দেনার দায়ে জমি বিক্রি ও বন্ধক বেড়ে যাওয়ায় কৃষকদের মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার ঘটে। এই ক্ষোভ আন্দোলনের রূপায়ণের ক্ষেত্রে প্রধান প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে উপযুক্ত নেতৃত্ব। বাংলার ভূমি সমস্যা গ্রন্থে বলা হয়- ছোট চাষীদের অবস্থা খারাপ হচ্ছে, জমিদার ও উৎখাত হওয়া কৃষকদের মধ্যে বৈপরীত্য বাড়ছে।[২২] ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে কৃষকদের শ্রেণী চেতনা মৃদু স্পন্দন বর্তমান কৃষি মোকাবিলার পটভূমিতে কমিউনিস্টদের উদ্যোগে কৃষকসভা প্রতিষ্ঠিত হলেও তা ছিল খুবই দুর্বল। জমিদারি ব্যবস্থার কুফল এবং তা উচ্ছেদ করে কৃষকদের হাতে জমি দেওয়ার দাবি শুরু থেকে প্রচারের মধ্যে থাকলেও সঙ্ঘ শক্তির সাহায্যে তা কার্যকরী করার মত পরিস্থিতি ছিল না। তখন রাষ্ট্রশক্তির আঘাতকে মোকাবিলা করার মতো শক্তি না থাকলে প্রচলিত সম্পত্তি সম্পর্কের উপর আঘাত করা যায় না। মূল দাবিকে প্রচারে রেখে ছোটখাটো আংশিক দাবিগুলির মাধ্যমে আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে কৃষক সভার প্রভাব

বাড়তে থাকে। ১৯৩৪ সালে থেকে কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ ছিল তবে কমিউনিস্ট নেতারা কংগ্রেসের ভেতর থেকেই নানা মঞ্চ ব্যবহার করে কাজ করতে থাকছিলেন। এইভাবে ১৯৩৬ সালে- The All India Kisan sabha watch form in 1936 who is organised partial struggles' focusing on the demands of rent paying tenants in the Bengal the communist took the lead in organising the provincial Kisan sabha as a branch of all India Kisan Sabha with in a year kishan sabha units were formed in the districts.[২৩] ১৯৩৭ সালে বহু কমিউনিস্ট নেতা ছাড়া পায় ফলে কৃষক আন্দোলন আগের থেকে জোরদার হতে থাকে এই সময় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় কংগ্রেস থেকে আলাদাভাবে কৃষকদের নিজস্ব শ্রেণীর সংগঠন গড়ে তুলতে হবে কারণ কংগ্রেস কর্মী হিসেবে মূলত যোগাযোগ থাকত জোতদার ও ধনী কৃষকদের সঙ্গে। কৃষকদের প্রকৃত অবস্থা ও তাদের ওপর ঘটিত শোষণেররূপ এবং কৃষক সমাজের শ্রেণীবিন্যাস- সমস্ত ধারণা তাদের কাছে ছিল অস্বচ্ছ। স্বচ্ছ ধারণার উদ্দেশ্যে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল সবচেয়ে জরুরী। তাই সংগঠনের প্রাথমিক কাজ ছিল কৃষকদের সাথে যোগাযোগ সম্পর্ক স্থাপন এবং কৃষিব্যবস্থা ও তাদের জীবনের প্রকৃত চিত্র জানা। এই চিত্র জানার পর সিদ্ধান্ত নেওয়া হল যে- আধিয়ার-ই হল কৃষি ব্যবস্থার মূল সমস্যা।[২৪] এর ফলস্বরূপ প্রাদেশিক নেতৃত্বের সঙ্গে যোগাযোগের সুত্রে ১৯৩৮ সালের ২৩শে ডিসেম্বর কৃষক সংগঠন সমিতি গড়ে ওঠে, এই সময় সর্বপ্রথম দিনাজপুর শহরে পূর্ব ভারতের বিভিন্ন সাঁওতাল গোষ্ঠীর প্রতিনিধিদের নিয়ে সম্মেলন হয় এবং নিখিল ভারত সাঁওতাল সমিতি গঠনের মাধ্যমে সাঁওতালদের মধ্যে সামাজিক, শিক্ষাগত ও অর্থনৈতিক সংস্কার এবং বিভিন্ন দাবি সম্পর্কে আলোচনা ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। এর সাথে উত্তরবঙ্গে রাজবংশী, মুসলিম ও বাকি বিভিন্ন জনজাতির মানুষ যারা কৃষক হিসেবে পরিচিত ছিল সকলে একত্রিত হয়ে জোতদার ও জমিদারি ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলে কমিউনিস্টদের নেতৃত্বে,যার ফল স্বরূপ ১৯৩৯ সালে তিন জেলা- জলপাইগুড়ি,দিনাজপুর ও রংপুরে হাটের তোলা বন্ধের দাবিতে হাটতোলা বা তোলা গন্ডি আন্দোলন শুরু হয়। যথাক্রমে মালদহ, ময়মনসিংহ, যশোহর ও ২৪ পরগণা সহ অন্যান্য জেলায় প্রসারিত হয়ে যায়। জমিদারদের অন্যায় তোলাবাজির অত্যাধিক জুলুম সহ্য করতে না পেরে এই আন্দোলন গড়ে উঠেছিল । এই আন্দোলনের দাবি গুলি ছিল- (এক) কৃষকদের গণ্ডি নেই, (দুই) বাধা দোকানগুলি থেকে রশিদ দিয়ে খাজনা নিতে হবে, (তিন) গরু ছাগল প্রভৃতি ক্রয়ের রশিদ বাবদ আদায় কমাতে হবে, (চার) হাটের ইজারা তুলে দিয়ে কমিটির হাতে পরিচালনার দায়িত্ব দিতে হবে। এই আন্দোলনের দায়িত্বে ছিলেন মুজাফফরপুর আহমেদ, সুশীল সেন, শচীন দাশগুপ্ত, সুনীল সেন, নরেশ চক্রবর্তী, গুরুদাস রায়, মনোরঞ্জন দাশগুপ্ত, অবনীতলা পাত্র, গুরুদাস তালুকদার, বিমল হোর, অবনী বাগচী ও দীনেশ লাহিড়ী প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। এই আন্দোলনের ফলে কৃষকরা হাটে বা মেলায় আর কোন অন্যায় তোলা বা খাজনা দেওয়া বন্ধ করে দেয়।

কৃষকদের হাটতোলা বা টোলা গান্ডি আন্দোলন দীর্ঘায়িত না হলেও কৃষকরা কোনভাবেই থামতে রাজি ছিল না, তাই ১৯৪০ সালে কৃষকদের সাথে আধিয়ার রাও আন্দোলন শুরু করে যা আধিয়ার আন্দোলন নামে পরিচিত। তখনকার দিনে অনেক অঞ্চলে নিয়ম ছিল আধিয়ার রা জমিতে যে ফসল বুনেছে সেই ফসল কেটে দিয়ে জোরদারদের গলায় বা খোলানে তুলে দিয়ে আসবে। ভাগচাষীদের নির্মম অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে জানা যায় জোতদারদের কব্জায়ে একবার ধান চলে গেলে, তার কপালএ আধি-তো জুটবেই না, অপরন্ত নানা অজুহাতে নানা পাওনার নাম করে সেই আধি থেকে মোটা অংশ কেটে নেবে জোতদার। শেষ পর্যন্ত তাকে শূন্য হাতেই ফিরতে হবে। তাই এই আন্দোলনের সাথে সাথে চারিদিকে আওয়াজ উঠল জোতদারদের খোলানে ধান নয়- "নিজে খোলেনে ধান তোলো", "কর্জা ধানের সুদ নাই"। এই আন্দোলেনের দাবিগুলি ছিল - (এক) উৎপন্ন ফসলের তিন ভাগের দুই ভাগ চাষি পাবে আর এক ভাগ জোতদার এবং আইনগতভাবে মালিক তিন ভাগের এক ভাগের বেশি আদায় করতে পারবে না, (দুই) ভাগচাষীদের বর্গা জমি থেকে স্বেচ্ছায় উৎখাত করা যাবে না ,জমিতে ভাগচাষীদের দখলি স্বত্ব দিতে হবে, (তিন) সুদের হার ধান বা টাকা কোন ঋণের বেলাতেই আট ভাগের এক ভাগের বেশি হবে না,এক মন ধান ও এক সেসের বেশি সুদ নাই, (চার) করালি প্রথা দণ্ডনীয় হবে, (পাঁচ) কর্জা ব্যবস্থার জন্য প্রতি ইউনিয়নে সরকারি গোলা স্থাপন করা হবে, (ছয়) জমি থেকে উচ্ছেদ করা খাদ্য মজুদ করা ও ধান থাকতে ভাগচাষিকে ন্যায্য সুদে কর্জা দিতে অস্বীকার করা, আইনত অপরাধ হবে, (সাত) সব রকম আবওয়াব

আইনগতভাবে দণ্ডনীয় হবে, (আট) রশিদ না দিয়ে ভাগচাষীদের কাছ থেকে ধান নেওয়া যাবে না, রসিদ না দিয়ে ধান নিলে বিচার হবে, (নয়) জমি পতিত ফেলে রাখা দণ্ডনীয় অপরাধ হবে, ভূমিহীন গরিব কৃষকদের পতিত জমি চাষ করবার ও তার ফসল নেওয়ার অধিকার দিতে হবে, (দশ) ভূমিহীনদের জন্য সস্তা দরে সরকার থেকে চাল সরবরাহের ব্যবস্থা করতে হবে। কিন্তু বর্গাদার সহ কৃষকদের হাটে পণ্য বিক্রির সময় জমিদার ও জোতদারদের সেস বা তোলা দিতে হতো। পশ্চিমবঙ্গের সরকারের তদন্তে প্রতিবেদনে বলা হয়, প্রদেশে ছয় হাজারের বেশি হাট গুলি বেশির ভাগই স্থানীয় জমিদারদের অধীন অথবা তাদের নিজস্ব কর্মচারীদের দিয়ে পরিচালনা করা হতো বা বার্ষিক ভাড়ায় ইজারাদারদের লিজ দিয়েছিলেন, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এই তোলা শুধুমাত্র বিক্রেতাদের কাছ থেকে নয় ক্রেতাদের কাছ থেকেও অতিরিক্ত হারে আদায় করা হতো।[২৫] এরপর আধিয়াররা বহু স্থানে ধান তুলতে লাগল নিজেদের খোলানে। এইভাবে আন্দোলন বৃহত্তর রূপ নিলে আতঙ্কিত জোতদাররা পুলিশের সাহায্যে আন্দোলন দমনের উদ্দেশ্যে শুরু হয় নির্মম অত্যাচার। আদ্রিয়ান কুপার বলেন- ১৯৩৯ সাল থেকেই অন্যায় ভাবে তোলা দেয় ও গান্ডি খাজনা আদায়ের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু হয় এবং যেহেতু মুষ্টিমেয় জোতদার ছাড়া অধিকাংশ মানুষই ছিল আধিয়ার ও ভূমিহীন কৃষক, তাই কৃষক সভার নেতৃত্বে এই এলাকায় আধিয়ার আন্দোলন শুরু করে এবং সাধারন মানুষ, কমিউনিস্ট মাধব দত্ত ও গুরুদাস রায়ের নেতৃত্বে-কর্জা ধানের সুদ নাই ও নিজের খোলানে ধান তোলো এবং বেআইনি আদায় বন্ধ করো প্রভৃতি দাবিগুলি তীব্রতর হয়ে ওঠে।[২৬]

কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দা কৃষকদের আন্দোলন অনেকটা দুর্বল করে তোলে বিশেষত ১৯৪৩ সালে বাংলার বুকে নেমে আসা দুর্ভিক্ষ ও মহামারী, যার দরুন বাংলার প্রায় ৩৫ লক্ষ মানুষ প্রাণ হারান। সরকার শুধু নির্বিকার থাকলো না, কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ নেতৃত্ব নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকল। এই সময় দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর প্রতিরোধের সকল দায়িত্ব কমিউনিস্ট পার্টি ও কৃষক সভা নিজেদের ঘাড়ে তুলে নিয়েছিল। এখানে উল্লেখ্য যে ৪৩ সালে দুর্ভিক্ষের পর কর্জা ধানের সুদের চরিত্র বদলে যায় একে বলে কড়ারি অর্থাৎ আধিয়াররা যখন ধান কর্জা নেয় তখন বাজারে বছরের সবচেয়ে বেশি ধানের দাম থাকে। বলা যায় অর্থ নৈতিক মন্দা- দুর্ভিক্ষ - মহামারী কোনো পরিস্থিতি থেকে কৃষকরা নিস্তার পেল না। বিশেষত ১৯৪৩ সালে কমিউনিস্টরা ভারত ছাড়ো আন্দোলনে যোগ দিলেন না তখন অনেকের মধ্যে কমিউনিস্ট বিরোধী মনোভাব তৈরি হলেও কৃষক আন্দোলনের সমর্থনে এই কমিউনিস্টরাই কৃষক শ্রেণীর মধ্যে খুবই অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল। বহু কৃষক স্বেচ্ছায় আন্দোলনের জন্য ভলেন্টিয়ার হিসেবে যোগদান করতে থাকল। বিশেষ করে ১৯৪৬ সালের আইনসভা নির্বাচনে দিনাজপুর জেলার কমিউনিস্ট কৃষক নেতা রূপনারায়ণ রায় জয়ী হলে কমিউনিস্টদের ওপর কৃষকদের বিশ্বাস নজরে আসে। এর সাথে সাথে সাধারণ মানুষ,নিম্ন শ্রেনির মানুষ ও জনজাতি সম্প্রদায়ের মনে সামাজিক বৈষম্যর গণ্ডি ভেদ করে এলো শ্রেণী চেতনা এবং বঞ্চিত অবহেলিত কৃষক শ্রেণীর নামটা উঠে এলো সবার উপরে। রূপনারায়ণ রায়ের জয়লাভ বাংলায় কৃষক আন্দোলনে এক নতুন সম্ভাবনার দুয়ার খুলে দিয়েছিল।

অবশেষে ১৯৪৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভা তেভাগার ডাক দেয়। বাংলায় কৃষি ব্যবস্থা, ভাগচাষী সমস্যা ও দুর্দশা, ভাগচাষীদের তেভাগা সম্পর্কে যৌতিকতা, সমাজের অগ্রগতি ও বৃহত্তর স্বার্থে ভাগচাষীদের দাবি সমর্থনে কেন মধ্যবিত্ত ও অন্যান্য অংশের মানুষের এগিয়ে আসা দরকার প্রভৃতি ব্যখ্যার সাথে সাথে নির্দেশ দেওয়া হয়- 'তাড়াতাড়ি ধান কাটো', 'তেভাগার কমে আপোস নাই, সমিতির বাইরে কৃষক নাই', 'বাড়ি বাড়ি ভলেন্টিয়ার চাই' ইত্যাদি। দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি ও রংপুর এই তিনটি জেলায় আন্দোলন প্রথম শুরু হয়। দিনাজপুরের ঠাকুরগাঁওয়ের আটোয়ারী থানার অঞ্চলে কমরেড বিভূতি গুহ ও অজিত রায়, গুরুদাস তালুকদার, জনাথন ভট্টাচার্য, কালি সরকার, বসন্ত চ্যাটার্জী, সুধীর সমাজপতি, রূপনারায়ণ রায়ের নেতৃত্বে কর্মীরা ব্যাপকভাবে প্রচার অভিযান চালায়। কৃষক-আধিয়াররা দু হাত তুলে প্রবল উৎসাহে দাবি গুলিকে সমর্থন করে। জলপাইগুড়ির পচাগড় অঞ্চলেও ব্যাপকভাবে আন্দোলন শুরু হয় চারু মজুমদারের নেতৃত্বে। রংপুরে নেতৃত্ব দেন মনি কৃষ্ণ সেন, দীনেশ লাহিড়ী, মহি বাগচী। এনারা প্রচুর সভা করেন এবং কৃষকদের একত্রিত করেন। ডিসেম্বর মাসের ধান কাটার সময় আন্দোলন জঙ্গি রূপ ধারণ করে। কৃষকরা ধান কেটে দুই তৃতীয়াংশ ভাগ নিজেদের খোলানে তুলে বাকি অংশ জমিদারদের দেয়। এই সময় বাংলার ২২ টি জেলার ১৯ টি জেলাতে প্রায় ৬০ লক্ষ কৃষক একত্রিত হয়ে জোতদার ও জমিদারদের ওপর ঝাপিয়ে পড়ে। আন্দোলন করতে হলে অর্থ চাই ,লোকবল চাই সেই জন্য আন্দোলনের মধ্যে

থেকে আওয়াজ ওঠে-এক টাকা, একলোক, এক লাঠি। আধুনিক অস্ত্রের কাছে লাঠি কিছু নয় কিন্তু লাঠি ছিল সাহসের প্রতীক, এর সাথে ছিল দা, কাস্তে, হাতুড়ি ও সাঁওতালদের তির-ধনুক। সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদির বিরুদ্ধে তেভাগা হয়ে উঠেছিল ঐক্যের প্রতীক। সংগ্রামের স্বীকৃতি রূপ হিসেবে জোতদারদের খোলান ঘেরাও শুরু করেছিল তেভাগার এই সংগ্রামী কৃষক সম্প্রদায়। তেভাগা আন্দোলন বোদা, পচাগড় ও দেবিগঞ্জ থানা কৃষকদের মনে উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করেছিল প্রতিদিন শত শত কৃষক স্বেচ্ছাসেবক জোতদারদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য তাদের নাম নথিভুক্ত করে।[২৭] সর্বত্র উঠল লাল ঝাণ্ডার ধ্বনি ইনক্লাব জিন্দাবাদ। তেভাগা আন্দোলন সামান্য দু'মুঠো ধানের আন্দোলন হলেও তার পেছনে রাজনৈতিক চেতনা কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করেছিল। একটি সরকারি রিপোর্ট থেকে দিনাজপুর জেলায় তেভাগার তীব্রতা জানা যায় -কৃষক সমিতির স্বেচ্ছাসেবকরা গ্রামে গ্রামে জোতদারদের বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলে আর আধিয়ারদের তাদের সাথে কাজ করতে বারণ করে, এতে জোরদার দের বিরুদ্ধে বেশ তিক্ততা তৈরি হয়েছিল। ১৯৪৬ সালের মাঝামাঝি থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত আধিয়ার ও ভূমিহীন কৃষকদের বড় দল থেকে ক্ষেত থেকে ধান লুঠ শুরু করে। তাদের পদ্ধতি ছিল ক্ষেতে ২০০-৩০০ লোক ত্রিশ চল্লিশ মিনিটের মধ্যে সমস্ত ফসল কেটে নেয় এবং কিছু আধিয়ারের বাড়িতে রাখা হয় এবং অন্যান্য জমিতেও এই পুনরাবৃত্তি করা হয়।[২৮] এই আন্দোলন শহর থেকে গ্রাম বিভিন্ন প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। এমনকি প্রত্যন্ত গ্রামগুলিতেও আন্দোলন তীব্র হয়েছে ভাগচাষীরা ঐক্যবদ্ধভাবে জমিদারদের জমি থেকে ফসল সংগ্রহ করে এবং দখল করে জোতদারদের কাছ থেকে রশিদ আদায় করে ফসলের ১/৩ ভাগ দেওয়া শর্তে। দ্বিতীয় পর্যায়ে ভাগচাষীরা জোতদারদের খামার থেকে ফসলের ২/৩ ভাগ সংগ্রহ করে ১/৩ ভাগ জোতদারদের জন্য রেখে দেয় শুরুতে জোতদাররা আক্রমণাত্মক ছিল তবে তারা আশা করেছিল স্থানীয় প্রশাসন আন্দোলন বন্ধ করবে। শেষ পর্যন্ত তারা ভাগচাষীদের সুবিধা দেয়। ১৪৪ ধারা চালু হলে পরিস্থিতি শান্ত হয় এতে আশা করা হয়েছিল যে ভাগচাষীরা জোতদারদের জমিতে আবার চাষ শুরু করবে।[২৯]

কৃষকদের সাথে সাথে উত্তরবঙ্গের চা শ্রমিক ও রেলের সাথে যুক্ত মজদুররাও তেভাগা আন্দোলন সমর্থন করেছিল। ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে রেলওয়ে কনস্টিটিউন্সি থেকে জ্যোতি বসু নির্বাচিত হলে এবং ডুয়ার্সে ব্রহ্ম লাল রতন জয়লাভ হলে কৃষক দের সাথে সাথে শ্রমিকরাও এই আন্দোলন সমর্থন ও যোগদান করে। ১৯৪৬ সালে ডুয়াসের বাগানে মজদুর ইউনিয়ন গঠন হয়, জন সভায় ধ্বনি ওঠে- বিলায়েতি মালিক লন্ডন ভাগো।[৩০] কৃষক ও শ্রমিক হিসেবে পরিচিত সাঁওতালরা তেভাগা লাভের আশায় নিজেদের সর্বস্ব দিয়ে আন্দোলনে শামিল হয় । সরকারের নৃশ্রংশ হত্যা-লীলা চলতে থাকে কিন্তু তা উপেক্ষা করে সাঁওতাল কৃষকরাও বিন্দুমাত্র পিছপা হয়নি। এমনকি এই আন্দোলনে প্রথম শহীদ হয়েছিলেন এক মুসলমান কৃষক ও এক সাঁওতাল কৃষক। ১৯৪৭ সালের ৬ই জানুয়ারি যখন আন্দোলন দমনের উদ্দেশ্যে সরকার ও জোতদার মিলিতভাবে কৃষক খুনে লিপ্ত হয় তখন চিরের বন্দর থানায় বাজিতপুর গ্রামে নিরীহ কৃষক সমীরুদ্দীনকে বাড়ি থেকে তুলে গুলি করে হত্যা করে এবং তারই প্রতিবাদে শিবরাম মাঝি তীর ধনুক চালান পুলিশকে লক্ষ্য করে এবং আরেক পুলিশ শিবরামকে গুলি করে] এই শহীদদের উদ্দেশ্যে জ্যোতি বসু বলেছিলেন- আমি নিশ্চিত যে দিনাজপুরের সমিরুদ্দিন এবং শিবরাম-এর মত মানুষেরা যারা প্রাণ দিয়েছেন তাদের এই প্রাণ দান ব্যর্থ হবে না। পুলিশের বুলেটে যখন তাদের দেহকে ঝাজরা করে দিয়েছে তখনও তারা- "তেভাগা চায়, জান দেবো তবু ধান দেব না" বলে লুটিয়ে পড়েছেন কারণ তারা জানতেন যে নিজেদের জীবন দান করেও যদি তাদের দাবি পূরণ হয় তবে আগামী দিনে তাদের সন্তানেরা ভালোভাবে বাঁচতে পারবে এবং তাদের প্রিয়জনদের চোখের জল ঘোচাতে পারবে। তাই কয়েক দানা সশ্যের জন্য তারা প্রাণ দিলেন।[৩১] এর সাথে সাথে বহু মুসলমান ও সাঁওতাল কৃষকরা আহত হয়েছিল।

পুলিশের বর্বরতা দিন দিন বেড়েই চলেছিল। কিন্তু কৃষকরাও থেমে থাকেনি। ফেব্রুয়ারি মাসেও পুলিশি অত্যাচার ব্যাপকহারে বৃদ্ধি পায় তাদের উদ্দেশ্য ছিল চূড়ান্ত আঘাত হেনে আন্দোলনকে চিরতরে রুখে দেওয়া কিন্তু কৃষকরাও দমবার পাত্র নয়। ফলে ২০ শে ফেব্রুয়ারি আপুরে কৃষকদের একটি বিশাল জনসমাবেশ হয়। সেখানে পুলিশ কৃষকদের উপরগুলি বর্ষণ করেন। পুলিশের গুলিতে ২২ জন কৃষক মারা যায়। এদের মধ্যে সাত জন আদিবাসী। তিনজন সাঁওতাল। তিনজন সাঁওতাল কৃষক হলেন- হপন মান্ডি, নারায়ণ মুর্মু ও মাঝি সরেন। আবার দিনাজপুরের ঠাকুরগাঁওয়ে ২৫ শে ফেব্রুয়ারি রানী মিত্র বিনাগুহ সমাবেশে বক্ততা দিতে এসেছিলেন কিন্তু ওনাকে

বক্তৃতা দিতে দেওয়া হয়নি। তবুও একদল পুলিশ এই বিশাল সমাবেশে গুলি চালাতে শুরু করে। এ বিষয়ে সুনীল সেন বলেন- কৃষকরা চলে যেতে শুরু করেছেন এমন সময় পুলিশ গুলি চালায়। মিছিলটি ছিল পুরোপুরি শান্তিপূর্ণ। কৃষকরা লড়াই করার জন্য আসেনি, এসেছিলেন মিছিল করতে। দুজন রাজবংশী কৃষক ও হীরামন মোহাম্মদ নামে একজন দরিদ্র মুসলমান কৃষক ঘটনাস্থলেই মারা যায়। দুজন সাঁওতাল কৃষক হেমেন হেমরম ও হেতু হেমরম গুলিতে আহত হয় এবং হাসপাতালে পরে মারা যায়।

১৯৪০ এর সময়ে সাঁওতাল কৃষকদের মধ্যে এক নেতা ছিলেন ভুজু টুডু। প্রথমে তিনি কংগ্রেস নেতৃত্বের সাথে যুক্ত থাকলেও কৃষকদের প্রতি কংগ্রেসের স্থির ও উদাসীন মনোভাব তাকে ব্যথিত করেছিল, যার ফলে পরবর্তীতে তিনি কমিউনিস্টে যোগদান করেন এবং নিজের সাথে সাথে অসংখ্য সাঁওতাল কৃষকদের একত্রিত করে আন্দোলনে শামিল করেন। এছাড়াও দিনাজপুরের আরো কিছু সাঁওতাল যুবক ছিলেন যারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন- মাঝি মুর্মু, দুর্গা টুডু, এমা টুডু, গুডে হাসদা, হারমা মুর্মু। তবে একটি ঘটনা বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য যে- ১৯৪৭ সালের ৬৪ এপ্রিল ডুয়ার্সের হপনা মাঝি একজন চাষ-শ্রমিক বাল গোবিন্দ জোতে একটি কাগজে পলাশের মাঠ লিখে আম গাছে টাঙিয়ে দেয়, উদ্দেশ্যে এটা দেখানো হয় যে সিরাজ যেরকম লর্ড ক্লাইভ এর সাথে যুদ্ধ করেছিল সেই ভাবেই তেভাগার জন্য জোতদারের সঙ্গে লড়াই করবে কৃষকরা মহাবাড়ি গয়ামাত জোতে তেভাগা করতে গিয়ে পুলিশের গুলিতে নিহত হন।

তেভাগা, কৃষকদের উন্নতির জন্য ছিল এক খুবই সাধারণ ও ন্যায্য দাবি। এই আন্দোলনে উত্তরবঙ্গের সাথে সাথে পূর্ববঙ্গ সহ মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বীরভূম , মুর্শিদাবাদ, হুগলি, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার প্রায় সমস্ত অঞ্চলেই ছড়িয়ে পড়েছিল। বাংলার প্রায় ৬০ লক্ষ কৃষক নিঃস্বার্থভাবে এগিয়ে এসেছিল। তবে সাঁওতালরাও পায়ে পা মিলিয়ে আন্দোলনে যোগদান করেছিল। ১৯৩০ এর দশকে রানীনগর অঞ্চলের পারু সাঁওতালের বিদ্রোহ বা মালদহ সাঁওতালের আদিনা মসজিদ বিদ্রোহ এবং 1936 সালের দিনাজপুরে সর্বভারতীয় সাঁওতাল সম্মেলনের পরেই এই আদিবাসী গোষ্ঠীর মধ্যে ক্রমশ রাজনৈতিক চেতনা একটি নবপর্যায়ে উন্নীত হয়। কমিউনিস্ট পার্টি পরিচালিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভা এই সময় থেকে সাঁওতাল জনজাতির মধ্যে সাংগঠনিক প্রভাব বিস্তার করতে সচেষ্ট হয়েছিল।[৩২] দেখা যায় যে হিন্দু-মুসলমান, নিজেদের মধ্যে বিভেদ ছিল অর্থাৎ হিন্দু-মুসলিমদের মধ্যেও অনেকে বুর্জোয়া ও মধ্যবর্তী ছিল। কৃষক ছাড়াও সমাজে বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদের আধিক্য ছিল। অপরদিকে সাঁওতালদের পরিচয় ছিল কৃষক হিসেবেই, তা না হলে চাষী মজদুর বা শ্রমিক হিসেবে তাই এই তেভাগার প্রয়োজন সাঁওতাল কৃষকদেরই বেশি ছিল। তাছাড়া এই সময় খাওয়ার মান রাজবংশী ও সাঁওতালদের খুবই নীচু ছিল। অন্যান্য জেলায় কৃষকদের খাবারের মান বোধহয় এত নিচু ছিল না। সাঁওতাল কৃষকদের প্রধান অস্ত্র ছিল তির ধনুক যা সাধারণ কৃষকদের মনে আন্দোলন চলাকালীন বলও এনেছিল সন্দেহ নেই। মুসলমান কৃষকরা অনেক অঞ্চলে তেভাগা আন্দোলনে শামিল হয়েছিল। বিখ্যাত নেতা দানিশ হাজী মোহাম্মদ মনে প্রানে যোগ দিয়েছিলেন। এই কৃষক সংগ্রামে মুসলমান শ্রমিক ও কৃষকদের সংঘটিত করা ক্ষেত্রে তার অবদান কম ছিল না। বিভিন্ন অঞ্চলে মুসলমানকর্মীও গড়ে উঠেছিল। তবুও স্বীকার করতে হয় যে মুসলমানরা ব্যাপকভাবে কৃষক আন্দোলন নামেনি যেমনটি এসেছিল সাঁওতাল ও রাজবংশী কৃষকরা। এইসব বাধা সত্বেও শ্রেণী চেতনা ও শ্রেণী সংগ্রাম সেদিন সাম্প্রদায়িকতার প্রাচীর ভসিয়ে দিয়েছিল। ক্ষেত মজুর থেকে মাঝারি শ্রমিক ও কৃষক তো বটেই এমনকি কিছু ধনী কৃষকও অনেক ভাগচাষীদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। তাদের আশা ছিল তেভাগা আন্দোলন হলে জোতদারদের বিরুদ্ধে এই লড়াই বিজয়ী হলে পরবর্তী লড়াইয়ের পথ প্রশস্ত হবে। আন্দোলনকে ভাঙ্গার উদ্দেশ্যে হিন্দু-মুসলমানরা প্রচুর অর্থ ব্যয় করে ধর্মীয় অনুষ্ঠান করে ছত্রভঙ্গ করার চেষ্টা করে। কিন্তু আন্দোলনের জোয়ারে জাতপাত ও ধর্মের সীমা রেখা মুছে যায়। সাঁওতাল, রাজবংশী, মুসলমান সব জাতির মানুষ একত্রিত হয়ে এই আন্দোলনে শামিল হয় এবং ধর্মনিরপেক্ষভাবে কৃষক শ্রেণীর উত্থান ঘটে। অবনী লাহিড়ী লিখেছেন দুর্ভিক্ষ আনুমানিক প্রায় ২০ লক্ষ দরিদ্র কৃষক ও তাদের পরিবারকে ভূমিহীন সর্বহারা হিসেবে কৃষক সংগ্রামের জন্য তৈরি করেছিল। যখন জমি ও জমির উৎপাদন ধনী কৃষক ব্যবসায়ী ও জোরদারদের হাতে আরও বেশি কেন্দ্রীভূত হয়েছিল, যা বাংলা কৃষি পরিস্থিতিতে এক নতুন বৈপ্লবিক মাত্রা যোগ করে তেভাগা সংগ্রামকে ত্বরান্বিত করেছিল।[৩৩] তবে এ কথা অনস্বীকার্য তেভাগা আন্দোলনের ব্যর্থতা এবং ১৯৪৭ সালের ১৫ ই আগস্ট স্বাধীনতা লাভের পর সাঁওতালদের

মনে এই শ্রেণি চেতনা তাদের সমাজের মূল ধারার দিকে নিয়ে এনেছিল। এর সাথে সাঁওতালদের সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে জমির অধিকারের সাথে সাথে শিক্ষার ক্ষেত্রে আগ্রহী করে তুলেছিল। এই শ্রেণি চেতনা সাধারণ মানুষের মধ্যে এক নতুন আশার সঞ্চার হয়েছিল ফলে পরবর্তীতে বাংলার রাজনীতিতে নেতৃত্ব গ্রহণে বুর্জোয়া শ্রেণীর সাথে সাথে সাধারণ মানুষ তথা সাঁওতালরাও এগিয়ে এসেছিল।

তথ্যসুত্র:

১. রায়, সুপ্রকাশ। ভারতের কৃষক আন্দোলন ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম (প্রথম খণ্ড) । ডী এন বি এ ব্রাদার্স। ১৯৬৬ কলকাতা, পৃ: ৫।
২. মিত্র, বিশ্বমিত্র গৌতম। (সম্পাদিত), অভিজাত্রিক: চব্বিশ পরগণার শ্রমিক কৃষক আন্দোলন ও প্রভাস রায়। ২০২২ কলকাতা, পৃ: ২৫।
৩. গণশক্তি, আগস্ট, ১৯৩৮
৪. O'Mally L.S.S, Bengal District Gazetteer: Santal Parganas, Logos Press, 1910, 1999 (Reprint) Calcutta, Page- 4.
৫. Hunter, W.W. Annals of Rural Bengal. Leypoldt and Holt,1868. New york, Page- 29.
৬. Sinha J.C., Economic Annals of Bengal, Maclin and Co. Limited, 1827, London, Page- 103
৭. Dasgupta, Ranjit. Economic Society and Politics of Bengal: Jalpaiguri 1869-1947. OUP, 1992, New Delhi, Page- 132.
৮. চৌধুরী, বিনয়ভূষণ। পূর্ব ভারতের গ্রামীণ ক্ষমতা ও কৃষি উৎপাদন। সুগত বসু, বাংলায় কৃষি সমাজের গড়ন। কে পি বাগচি এবং কোম্পানি। ১৯৯৫, কলকাতা, পৃ: ১৪।
৯. মৌলিক, সত্যেন্দ্র চন্দ্র। প্রভানাথ সিংহ রায়। বাংলার ভূমি সমস্যা। ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন। ১৯৩৭, কলকাতা, পৃ: ১-৫।
১০. মজুমদার, শঙ্কর। মেদিনীপুর জেলায় আর্থসামাজিক অবস্থা পরিবর্তনের ধারা, পশ্চিমবঙ্গঃ মেদিনীপুর জেলা সংখ্যা, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ। পশ্চিমবঙ্গ সরকার। ১৪১০, কলকাতা, পৃ: ২২৫-২৩২।
১১. গুপ্ত, রঞ্জন। ঔপনিবেশিক বীরভূমের অর্থনীতিঃ সংক্ষিপ্ত রূপরেখা (১৭৬৫-১৮৭৫), পশ্চিমবঙ্গ: বীরভূম জেলা সংখ্যা, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ। পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৪১২, কলকাতা, পৃ: ৩৩-৪৬।
১২. Strong, F.W. Dinajpur District Gazetteer. The Pioneer Press. 1912, Allahabad. Page- 52-53.
১৩. Roy, B. District Census Handbook: West Dinajpur. The Superintendent. Government Printing. 1961, West Bengal, Page- xxxviii-xxxix.
১৪. Roy, B. District Census Handbook: Jalpaiguri. The Superintendent. Government Printing. 1961, West Bengal, Page- 102.
১৫. Kusari, Abani Mohan. Kiran Shankar Sengupta. West Bengal District Gazetteer. 1981 Jalpaguri, Page- 86.
১৬. O'Mally, L.S.S. Birbhum District Gazetteer. The Bengal Secretariat Book Depot. 1910, Calcutta, Page-36.
১৭. চৌধুরী, বিনয় ভূষণ। ধর্ম ও পূর্ব ভারতের কৃষক আন্দোলন। চতুরঙ্গ, জানুয়ারি, ১৯৮৯, পৃ: ৮৫০।
১৮. Sen, Sucibrata. The Santals of Jungle Mahals Through the Ages. Ashadeep. 2013, Kolkata, Page- 75.
১৯. Mcalpin, M.C. Report on the Condition of the Sonthals: Birbhum, Bankura. Midnapor and North Balasore. Bengal Secreteriat Press. 1909, Calcutta, Page- 24-38.

২০. Chatterjee, Partha. Bengal 1920-1947: The Land Question. K P Bagchi and Company. 1984(1st) 2014(Reprint). Kolkata, Page-84.
২১. বাস্কে, ধীরেন্দ্রনাথ। গণ আন্দোলনে সাঁওতাল সমাজ। বাস্কে পাবলিকেশন। ১৯৯৬। কলকাতা, পৃ: ৩০-৩৫।
২২. মৌলিক সত্যেন্দ্র চন্দ্র, সিংহ রায় প্রভানাথ, বাংলার ভূমি সমস্যা, ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন, ১৯৩৭, কলকাতা, পৃ: ১৭।
২৩. Sen, Sunil. Peasant Uprising in Bengal (1855-1947) Challenge a Saga of India's Struggle for Freedom. 1984, Delhi, Page- 371.
২৪. তেভাগার লড়াই, পশ্চিমবঙ্গঃ তেভাগা সংখ্যা। তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ। পশ্চিমবঙ্গ সরকার। ১৪০৪, পৃ: ১৫-২৫। প্রতিবেদনটি 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভার' দ্বারা প্রকাশিত পুস্তিকা থেকে গৃহীত।
২৫. Bose, Sugata. Agrerian Bengal: Economy, Social, Structure and Politics 1919-1947. Cambridge, 1986, Page- 74-75.
২৬. Cooper, Adrienne. Sharecropping and Sharecroppers' Struggles in Bengal 1930-1950. Calcutta, 1988, pp-123-145.
২৭. স্বাধীনতা, ২৯ নভেম্বর,১৯৪৬, প্রথম বর্ষ, নং- ৩।
২৮.West Bengal State Archives. Revenue Department. Kolkata, Subdivisional Officer. Dinajpur, 8th March, 1947.
২৯. ঘটক, মৈত্রী। বর্তিকা। বিশেষ তেভাগা সংখ্য। মহাশ্বেতা দেবী সম্পাদিত জুলাই। ডিসেম্বর, ১৯৮৭, পৃ: ৯১।
৩০. সেন, সুনীল। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের শেষ অধ্যায়। চতুরঙ্গ, ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৯, পৃ: ৮৪৮।
৩১. বসু জ্যোতি, গ্রামের আলকবর্তিতা তেভাগার শহিদেরা, তেভাগা থেকে অপারেশন বর্গা, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৭৯, পৃ: ২২-২৩।
৩২. দাস, সুস্নাত, অবিভক্ত বাংলার কৃষক সংগ্রাম। প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স। ২০০২(প্রথম) ২০১২(তৃতীয়), কলকাতা, পৃ: ১৬৭।
৩৩. Lahiri, Abani. Last Battle of Bengal Peasants under British Rule. Challenge: A Saga of Indias' struggle for freedom. 1984, Delhi, Page- 379.

.